উপসংহার

প্রথম অধ্যায়ে (১.১) সাধু ও চলিত ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়ে বাংলা গদ্যরীতির বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিকদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। ১.২ অধ্যায়ে বাংলা চলিত গদ্যের ইতিহাস খোঁজা হয়েছে এবং সেই ইতিহাসের ধারায় রবীন্দ্রনাথের অবস্থান নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে সাধুগদ্যরীতি থেকে চলিত গদ্যের সাহিত্য রচনা রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ও তার প্রয়োগ আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন—মধ্যযুগে সাহিত্যের মাধ্যম ছিল পদ্য। দলিল সস্তাবেজ, চিঠিতে গদ্যের কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায়। সেই গদ্য সাধু গদ্যের কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত। কখনও কখনও সাধুরীতির সঙ্গে কথ্যগদ্য স্থান পেত এরকম উদাহরণ পাওয়া যায়।

"সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে অর্থাৎ ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লেখা ঢাকা অঞ্চলের কথ্যভাষা মিশ্রিত একটা চুক্তিপত্রের সন্ধান দেন ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সংগ্রহ থেকে এই চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশ করেন। চুক্তিপত্রটি এই ঃ

১১০৩ সাল = ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দ

শ্রীকৃষ্ণ

যাখি শ্রীধর্ম

শ্রীযুক্ত মিত্রি গই সাহেব মিত্রি গারবেল / মহাসহেষু—লিখিতঁশ্রীকৃষ্ণদাস ও নরহরি দাস আগে আমরা দুই লুকে, করার করিলাম জে কিছু বারে (=কারে?) সুনা। রগায় ওগর খ (?) রি করিয়া আরত দালালি লইব।

আর কুন দায়া নাই বরাক সমেত এই নি। অমে করা। [র]

পত্র দিলাম স ১১০৩ / ৩১৪ আ। গ্রান—শ্রীকৃষ্ণদাস ও নরসিংহ দাস।

পত্রের পিছনে পৃষ্ঠায় পুরাতন ছাঁদের ইংরাজী হাতের লেখা ঃ

The Bramanies Carackter from Dacca. The Metropolies of Bengali in the East Indies. হাতের লেখা সবচেয়ে পুরাতন চুক্তিপত্র এটা।"[১]

মধ্যযুগে বাংলা লেখার কোন Guide line এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। তাই মধ্যযুগে বাংলা লেখার নির্দেশ কি ছিল তা জানবার উপায় নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথম বাংলা ব্যাকরণের আত্মপ্রকাশ বিদেশীদের হাতে। এপর্যন্ত বাংলা ভাষার যে বাংলা ভাষার যে ব্যাকরণখানি সর্বপ্রাচীন

বলে ঐতিহাসিক মহলে স্বীকৃত সেটির নাম "Vocabulario em idioma Bengalla e Portuguez dividido em dues parts," অর্থাৎ বাঙ্গালা ও পর্তুগীজ ভাষার শব্দকোষ দুইভাগে বিভক্ত। গ্রন্থের প্রথমভাগে আছে বাঙ্গালার ভাষার বৈরাকরণ সূত্র ও শেষভাগে পর্তুগীজ বাংলা শব্দকোষ। বইটির আখ্যাপত্র থেকে জানা যায় রচয়িতার নাম Fr. Manoel da Assumpcam এবং বইটির প্রকাশকাল ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দ। মনোএলের অপর গ্রন্থ "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ"-এর ভূমিকা থেকে জানা যায় গ্রন্থটি ভাওয়াল দেশে রচিত এবং গ্রন্থকার পূর্ববঙ্গের মৌখিক কথ্যভাষার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেছিলেন। সেকালের গদ্যে আঞ্চলিকতার প্রভাব ছিল ক্রিয়ার প্রাচীন রূপ গদ্যরীতিতে ব্যবহৃত হত। গদ্যে বৈষ্ণব কড়চায় তৎসম প্রাধান্য এবং দলিল দস্তাবেজে আরবী পারসীর প্রাধান্য দেখা যায়। তবে সেকালে কথ্য ও সাধুরীতির যে অবাধমিশ্রণ ছিল। মনোএল সেই মিশ্রভাষারূপের ব্যাকরণ প্রণয়ন করেছেন। পরবর্তীকালে, হ্যালহেডের ব্যাকরণ (১৭৭৮), কেরির ব্যাকরণ (১৮০১) রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ব্যকরণ' (১৮৩৩) বীমসের বাংলা ব্যাকরণ (১৮৯৪) প্রভৃতি ব্যকরণ মূলত সাধুগদ্যের ব্যাকরণ। রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছেন—"...কিন্তু যখন দেখি আজ পর্যন্ত কোন বাঙালি প্রাকৃত ব্যকরণ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই, তখন প্রলোভন সম্বরন করিয়া লইতে হয়। আমরা কেন বাংলা ব্যাকরণ লিখিতে গিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখি, আমাদের কোন শিক্ষিত লোককেও বাংলা ভাষার ব্যাকরণের নিয়ম জিজ্ঞাসা করিলে তাহার চক্ষুস্থির হইয়া যায় কেন, এসব ভাবিয়া দেখিলে নিজের উপর ধিক্কার ও সাহেবদের উপর শ্রদ্ধা জন্মে।"[২] বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রারম্ভিক উৎকর্ষ সাধুগদ্যে। বিদ্যাসাগরে বঙ্কিমের চরিত্রের সংলাপে কদাচিত কথ্যশব্দ প্রয়োগ চোখে পড়ে। সাধুগদ্য চরম উৎকর্ষে পৌঁছায় বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। সংবাদপত্র বাংলা গদ্যচর্চাকে ত্বরান্বিত করলেও সংবাদপত্রের গদ্যভাষা ছিল সাধু। রাধানাধ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্রের সম্পাদনায় 'মাসিক পত্রিকা' ছাড়া সকল পত্রিকা সাধুভাষায় লেখা হত। চলিত ভাষার জন্য আমাদের 'সবুজপত্রে'র যুগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ইসলামী শাসনকালে বাংলাচর্চা অবহেলিত ছিল। মূলত সংস্কৃত, আর্বি পারসীর চল ছিল। ১৮৩৫ সালের আগে পর্যন্ত সরকারী ভাষা ছিল পারসী। পরে ইংরাজী সেই স্থান দখল করে। এই সময় Adams Report-এ দেশীয় ভাষা চর্চার কথা বলা হয়। তাছাড়া ইংরেজ ভারতে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা দেয় 'হিন্দুকলেজ' প্রতিষ্ঠা (১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারি), পরবর্তীকালে 'স্কুল বুক সোসাইটির' প্রতিষ্ঠা (১৮১৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর), লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতির ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে জোয়ার আসে তখন দেশের বাংলা বিদ্যালয়গুলিতে বাংলা শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হল। কিন্তু বাংলা কথ্যরূপকে জোর না দিয়ে সংস্কৃত আশ্রিত সাধুগদ্যের উপর জোর দেওয়া হল। নির্মল দাশের মতে—"বাংলা ভাষার সংস্কার ও পুনর্গঠনের ব্যাপারে সংস্কৃত ভাষার আশ্রয়ের পেছনে ঐতিহাসিক কারণও যথেষ্ট বিদ্যমান। ঐতিহ্যগত অভ্যাসের অভাবে সে সময়ে বাংলা ভাষার লেখ্যরূপে কোন নির্দিষ্ট আদর্শ অনুসরণ করা হত না কোথাও পারসীর দিকে ঝোঁক, কোথাও সংস্কৃতের প্রতি পক্ষপাত, কোথাও বা লৌকিক ভাষার মিশ্রণের ফলে বাংলা গদ্যভাষার আদর্শগত অস্থিরতা। সেকালে বিদেশ পণ্ডিতদের মতো দেশী পণ্ডিতরাও সংস্কৃতানুগত্যকেই ভাষার শুদ্ধতার পরকাষ্ঠা বলে মনে করতেন।[৩] সেই কারণে বাংলা সাধুগদ্যের ভিত্তিভূমি শক্ত ভিতের উপর

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে 'সবুজপত্র' একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে ইতিহাস হয়ে আছে। ঊনিশ শতকের গোড়া থেকে সাধুগদ্য সাহিত্য সৃষ্টি হলেও অল্পকালের মধ্যে চলিত ভাষায় সাহিত্যকর্ম করার দাবি ওঠে। প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ সিকদারের সম্পাদনায় ১৮৫৪ সালের 'মাসিক পত্রিকায়' মুখের ভাষা বিশিষ্ট রূপ পেয়েছেন। পরবর্তীকালে 'আলালের ঘরের দুলাল (১৮৬১) হুতোম প্যাঁচার নক্সা (১৮৬২-৬৪), ভুবনচন্দ্রের 'হরিদাসের গুপ্তকথা' (১৮৭৩) ও 'সমাজ কুচিত্র' (১৮৬৫) ইত্যাদি চলিত গদ্যে রচিত হতে থাকে। তবুও চলিতরীতি সর্বজন স্বীকৃতি পায়নি। রবীন্দ্রনাথ চলিত গদ্য আন্দোলনকে সমর্থন করেন এবং চলিতরূপে আন্দোলনকে সমর্থন করেন এবং চলিতরূপে গদ্যচর্চা করতে থাকেন। সমকালীন পত্রপত্রিকা রবীন্দ্রনাথকে রকম কি রকম আক্রমণ করেছেন তা আমরা আলোচনা করেছি। 'সবুজপত্র' সম্পাদক অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথ আক্রান্ত হয়েছেন বেশি। আর রবীন্দ্রনাথ সেই ঐতিহাসিক গদ্যস্রষ্টা যাকে নিজ হাতে চলিত গদ্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে হয়েছিল এখানেই রবীন্দ্রনাথের চলিতগদ্য রচনার ঐতিহাসিক পরিচয় নিহিত রয়েছে। অরুণ মুখোপাধ্যায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন—"সাধুগদ্যের পরিপূর্ণ ও মহৎরূপটি আয়ত্ত্বে পাবার পর রবীন্দ্রনাথ চিরদিনের জন্য তার চর্চা ছাড়লেন। যিনি প্রাচীন সাহিত্য, বিচিত্র প্রবন্ধ, জীবনস্মৃতি লিখেছেন, তিনি যে আর কোনদিন সাধুগদ্যের চর্চা করলেন না একথা ভাবতে কষ্ট হয়।'[৪]

বাংলা চলিতগদ্যরীতি ইতিহাসে 'সবুজপত্র' ও প্রমথ চৌধুরীর গুরুত্ব এইখানেই রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলা যেতে পারে—'সবুজপত্রে সাহিত্যের এই একটি নূতন ভূমিকা রচনা প্রমথের প্রধান কৃতিত্ব। আমি তার কাছে ঋণ স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হইনি।'[৫]

রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন তখন বঙ্কিমচন্দ্র মধ্য গগনে। গদ্যসাহিত্যে বঙ্কিমের যুগ। বঙ্কিমের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর ছিল। কোন লেখকের উপর পূর্ববর্তী লেখকের প্রভাব পড়ে। তবে গদ্যরচনার ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ tradition কে মান্য করেছেন। সেই tradition ছিল সাধুগদ্যের।—"ছোটবেলা হইতেই সাহিত্যরচনায় লাগিয়াছি। বোধকরি সেইজন্যই ভাষাটা কেমন হওয়া উচিত সেসম্বন্ধে আমার স্পষ্ট কোন মত ছিল না। যে বয়সে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন, পুঁথির ভাষাতেই পুঁথি লেখা চাই, একথার সন্দেহ করিবার সাহস বা বুদ্ধি ছিল না।"[৬] এছাড়া অনেকগুলি বিষয় রবীন্দ্রনাথের গদ্যচর্চাকে প্রভাবিত করেছিল যেমন—১. সাধুগদ্যের ঐতিহ্য, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা, ২. পরিবারের সাহিত্য ভাষা চর্চা। ৩. পিতৃদেবের সাহিত্যচর্চার ভাষা, ৪. নিজের কবি হৃদয়, ৫. নাট্যব্যক্তিত্ব, রবীন্দ্রনাথের গদ্য পরিশীলিত মার্জিত ভাষার গদ্য। কোন slang শব্দ পাওয়া যায় নি। এই জন্য ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক মার্জিত পরিবেশই দায়ী বলে মনে হল। গদ্য ছাড়া পদ্য তাঁর কাছে সাবলীলতা প্রকাশক।—"এক জায়গায় আমার মন সংস্কার মুক্ত। পদ্যরচনায় আমি প্রচলিত আইন-কানুন কোনদিন মানি নাই। কবিতার ভাষা ও ছন্দের একটা বাঁধন আছে বটে, কিন্তু সে বাঁধন নূপুরের মতো, বেড়ির মতো নয়। এইজন্য কবিতার বাইরের শাসনকে উপেক্ষা করিতে কোনদিন ভয় পাই নাই।[৭]—৭. তিনি ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, ভ্রমণ কাহিনিতে চলিত

গদ্যব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন—"চিঠিপত্রে আমি চিরদিন কথ্য ভাষা ব্যবহার করিয়াছি। আমার সতেরো বছর বয়সে লিখিত 'য়ুরোপযাত্রীর পত্রে' এই ভাষা প্রয়োগের প্রমাণ আছে। তাছাড়া বক্তৃতা সভায় আমি চিরদিন প্রাকৃত বাংলা ব্যবহার করি, 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে তাহার উদাহরণ মিলিবে।'[৮] অনত্র তিনি বলেছেন "য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র" আগাগোড়া অরক্ষণীয়া নয়। এর স্বপক্ষে একটা কথা আছে সে হচ্ছে এর ভাষা। নিশ্চিত করে বলতে পারি নে কিন্তু বিশ্বাস বাংলা চলতি ভাষায় সহজ পটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।"[৯] এই ভাষা তাঁকে নিজেকে গড়তে হয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আলোচনাকালে একদা কবি বলেছিলেন—"বাংলা গদ্য আমাকে নিজেকে গড়তে হয়েছে। ভাষা ছিল না, পর্বে পর্বে স্তরে স্তরে তৈরি করতে হয়েছে আমাকে।"[১০] 'সবুজপত্র' পত্রিকার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের গদ্যচিন্তার গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রূপে বিবেচিত হয়। পবিত্র সরকার তাঁর 'গদ্যরীত পদ্যরীতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি আলোচনা প্রসঙ্গে সাধুচলিত সীমারেখার বলতে ১৯১৪র সবুজপত্রের সময়সীমাকে মানতে চাননি। তিনি সংশয় প্রকাশ করেছেন "১৯১৪ এর ম্যাজিক সীমারেখার আগেকার রবীন্দ্রনাথ লিখছেন কেবল সাধুভাষায় আর তার পরবর্তী রবীন্দ্রনাথ লিখছেন কেবল চলিত ভাষায়—এই অতিসরল হিসেবটি যথার্থ নয়।"

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ক্রমটি দেখানোর জন্য আমরা একটি লেখচিত্র তৈরি করেছি। সেই লেখচিত্রটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়। ১৯১৪ এর সীমারেখা নয়, রবীন্দ্রনাথ বিবর্তিত হয়েছেন ভাষাতাত্ত্বিক নিয়োমে, তা হঠাৎ করে আসেনি। তাঁর 'ভাষা ধীরে ধীরে ভাষাতাত্ত্বিক নিয়োমে পরিবর্তিত হয়েছে। 'সবুজপত্র' ছিল শুধু সেই বাইরের আঘাত। তাই বলা যায় 'সবুজপত্রের' আবির্ভাব (১৯১৪) চলিতরীতির কোন ম্যাজিক ব্যাপার নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষা ব্যবহারের প্রবণতার মধ্যেই সেই ক্রমটি নিহিত আছে যা সম্পূর্ণভাবে ভাষাবিজ্ঞান সম্মত।

পারিবারিক সাহিত্যচর্চার ঐতিহ্য, সাধুগদ্যরীতির উত্তরাধিকার ও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার আদর্শ তিনি উপন্যাস রচনাকরার আগে ঐতিহ্য হিসাবে পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শুধু একা নন অনেক সাহিত্যিকই বঙ্কিমকে সামনে রেখে সাহিত্যরচনা করতে প্রয়াসী হন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'করুণা'য় বঙ্কিমের অনুসরণে নর-নারীর জীবনে কম প্রবৃত্তির লীলা ও পরিণাম দেখাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্বপ্ন অভিজ্ঞতা ও অপরিণত জীবনবোধ নিয়ে তাঁর পক্ষে বঙ্কিমের উপন্যাসের জীবন রহস্য ও ট্রাজেডির স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব ছিল না। 'করুণা'র দুর্বলতা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। মাসিক পত্রিকা (ভারতী আশ্বিন-১২৮৪ ভাদ্র, ১২৮৫, ১৮৭৭-৭৮ খ্রীঃ) প্রকাশিত হবার পর গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন নি। এরপর বঙ্কিমের আদর্শে তিনি দুইখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন 'রাজর্ষি' ও 'বৌঠাকুরানীর হাট' কিন্তু এই দুই উপন্যাস তেমন প্রশংসিত হয়নি। আসলে ঐতিহাসিক উপন্যাসিক ধারায় বঙ্কিমচন্দ্র যে উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস দুটি সে উচ্চতায় পৌঁছতে পারে নি। এরপর রবীন্দ্র আর কোনদিন ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেননি। তাঁর হাত থেকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারা চিরদিনের জন্য লুপ্ত হল।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস রচনার ধারাবাহিকতা ছিল না। দু একটি উপন্যাস রচনার পর আবার দীর্ঘ বিরতি লক্ষ্য করা যায়। কবিতা বা নাটকের ক্ষেত্রে তা ছিল না।দীর্ঘ ১৫-১৬ বছরের বিরতির পর রবীন্দ্রনাথ আবার উপন্যাসে হাত দিলে 'চোখের বালি' (১৯০৩)। কাহিনি, চরিত্র পরিকল্পনা সবই বঙ্কিম থেকে নেওয়া। 'বঙ্গদর্শন' নবপর্যায়ে 'চোখের বালি বের হতে থাকল। 'বঙ্গদর্শন'-এর নব পর্যায়ের দায়িত্ব যখন দেওয়া হয় তা নেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রস্তুত ছিলেন না। উপন্যাসের পরিকল্পনাও তাঁর ছিল না। হঠাৎ করে দায়িত্ব এসে যাওয়ায় তিনি 'চোখের বালি' রচনায় হাত দেন। পত্রিকার দাবিই রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়পর্বের উপন্যাস 'চোখের বালি' 'নৌকাডুবি' রচনার কারণ। গ্রন্থের ভূমিকায় একথা স্পষ্ট করে বলা আছে।

"আমার সাহিত্যের পথযাত্রা পূর্বাপর অনুসরণ করে দেখলে ধরা পড়বে যে 'চোখের বালি' উপন্যাসটা আকস্মিক, কেবল আমার মধ্যে নয়, সেদিনকার বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে। বাইরে থেকে কোন্ ইশারা এসেছিল আমার মনে, সে প্রশ্নটা দুরূহ। সব চেয়ে সহজ জবাব হচ্ছে ধারাবাহিক লম্বা গল্পের উপর মাসিক পত্রের চিরকেলে দাবি নিয়ে। বঙ্গদর্শনের নবপর্যায় বের করলেন শ্রীশচন্দ্র। আমার নাম যোজনা করা হল, তাতে আমার প্রসন্ন মনের সমর্থন ছিল না। কোনো পূর্বতন খ্যাতির উত্তরাধিকার গ্রহণ করা সংকটের অবস্থা, আমার মনে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সংকোচ ছিল। কিন্তু আমার মনে উপরোধ-অনুরোধের দ্বন্দ্ব যেখানেই ঘটেছে সেখানে প্রায়ই আমি জয়লাভ করতে পারি নি, এবারেও তাই হল।[১১]

এরপূর্বে মহাকাশ গল্প সৃষ্টিতে হাত দিইনি। ছোটগল্পের উল্কাবৃষ্টি করেছি। ঠিক করতে হল, এবারকার গল্প বানাতে হবে এযুগের কারখানা ঘরে। শয়তানের হাতের বিষবৃক্ষের চাষ তখনো হত, এখনও হয় তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা।...তাই গল্পের আবদার যখন এড়াতে পারলুম না, তখন নামতে হল মনের সংসারের কারখানা ঘরে, যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে।...সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।" (চোখের বালির সূচনা)

এরপর রবীন্দ্র উপন্যাস ধারার দীর্ঘ বিরতি। প্রায় দু বছর। এবারেও পত্রিকার প্রয়োজন অর্থের তাগিদ। 'নৌকাডুবির' পর দুবছর রবীন্দ্রনাথ আর কোন উপন্যাস লেমেননি এমনকি ছোটগল্পও নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—

"একদিন রামানন্দবাবু আমাকে কোনো অনিশ্চিত গল্পের আগাম মূল্য স্বরূপ পাঠংলেন তিনশ টাকা। বললেন, যখন পারবেন লিখবেন, নাও যদি পারেন আমি কোনো দাবি করব না। এত বড়ো প্রস্তাব নিষ্ক্রিয়ভাবে হজম করা চলে না। লিখতে বসলুম। 'গোরা' আড়াই বছর ধরে মাসে মাসে নিয়মিত লিখেছি, কোনো কারণে একবারও ফাঁক দিইনি। যেমন লিখতুম তেমনি পাঠাতুম। যে-সব অংশ বাহুল্য মনে করতুম, কালির রেখায় কেটে দিতুম, সে-সব অংশেণ পরিমাণ অল্প ছিল না। নিজের লেখার প্রতি অবিচার করা আমার অভ্যাস। তাই ভাবি সেই বর্জিত আজি যদি পাওয়া যেত

তবে হয়তো সেদিনকার অনাদরের প্রতিকার করতুম।"[১২]

তবে 'গোরা'র মত আর কোন বড়মাপের মহাকাব্যিক উপন্যাস লেখেননি। 'গোরা'র ভাষা 'চোখের বালি'র ভাষা থেকে অনেক পরিণত। 'গোরা'র সংলাপের রবীন্দ্রনাথ প্রথম চলিত সংলাপ প্রয়োগ ঘটান। চলিত গদ্যের সচেতন ব্যবহার প্রথম গোরাতে পাওয়া গেল। 'গোরা' (১৯১০) ও 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২) দুটি গ্রন্থই 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয় ('গোরা' ভাদ্র-১৩১৪ চৈত্র ১৩১৬) 'জীবনস্মৃতি' ভাদ্র-১৩১৮ শ্রাবণ ১৩১৯) এই গ্রন্থদুটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথমে রচিত। 'গোরা' ও 'জীবনস্মৃতি'র ভাষা সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"রবীন্দ্রনাথ ভাষার মধ্যগতির কাছাকাছি এসে পৌঁচেছেন।...এ ভাষাকে মডেল করলে ক্ষুদে রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠবার আশঙ্কা থাকে না। শরৎচন্দ্র বলেছেন তিনি 'গোরা' পঞ্চাশবার পড়ে ভাষার মহড়া দিয়েছিলেন।"[১৩]

রবীন্দ্রনাথ তৃতীয় যুগ 'সবুজপত্র' বিচিত্রার যুগ (১৯১৪-১৯৪১ খ্রীঃ)। জীবনের এই শেষ পঁচিশ বছর রবীন্দ্র গদ্যের স্বর্ণযুগ। এই যুগ চলিত গদ্যের যুগ। গদ্যের শিক্ষারূপ নিয়ে নানা পরীক্ষা তিনি যেমন করেছেন, এইযুগেই গদ্যকবিতার জন্ম নিয়েছে, গদ্য ও পদ্যের দূরত্ব কমেছে। বাংলা গদ্যে কথ্যরীতির যে পরীক্ষা চলছিল। তাই শিল্পরূপ লাভ করল রবীন্দ্রনাথের হাতে। 'সবুজপত্র' সম্পাদকের চলিতভাষার তাগিদের থেকে রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্ত্বার তাগিদ কমছিল না। কেবলমাত্র 'সবুজপত্র' ও প্রমথ চৌধুরীর বাহিরেকার তাগিদে রবীন্দ্রনাথ সাধুগদ্য থেকে চলতি গদ্যে এলেন একথা অযথার্থ। আসলে তার মনের মধ্যে যে প্রেরণা অনেকদিন ধরে সঞ্চিত হয়েছিল বিবর্তনের ধারায় তার স্বতন্ত্ররূপ পেল। তাই যদি হত তাহলে 'চতুরঙ্গ' চলিত ভাষার উপন্যাস হয়ে উঠত। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে চলিতগদ্য নিয়ে এলেন ঘরে বাইরেতে কিন্তু মাঝখানে চতুরঙ্গ'র মধ্য দিয়ে। 'চতুরঙ্গ' রবীন্দ্রনাথের একটা পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় ফললাভ করার পর উপন্যাস ছোটগল্পে পাকাপাকি ভাবে চলিত গদ্য নিয়ে এলেন। যাইহোক 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস ও পত্রিকার প্রয়োজনে রচিত। 'সবুজপত্র' সম্পাদককে সাতটি ছোটগল্প দেবার পর অষ্টম সংখ্যায় (অঘ্রান ১৩২১) লিখলেন 'জ্যাঠামশায়' প্রথম অংশ তখন একে তিনি উপন্যাসের অংশরূপে পরিকল্পনা করেছিলেন কিনা সন্দেহ। কারণ উপন্যাসের নাম এতে ছিল না এবং রচনার শেষ উপন্যাসের কোন ইঙ্গিত ছিল না। যাইহোক 'জ্যাঠামশাই' শচীশ শ্রীবিলাস দামিনীকে নিয়ে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস সমাপ্ত হয় যার ভাষা বহিরঙ্গে সাধু অন্তরঙ্গে চলিত। 'চতুরঙ্গে'র পর 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত হয় রবীন্দ্র সাহিত্যের সর্বপ্রথম চলিত ভাষার উপন্যাস। 'যোগাযোগ' উপন্যাস 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরের বাইরে'-এর প্রায় বারো বছর পরে রচিত হয় 'যোগাযোগ' উপন্যাস। 'যোগাযোগ' উপন্যাস পত্রিকার প্রয়োজন ও অর্থের প্রয়োজনে রচিত। রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে তা স্পষ্ট।

'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে-বাইরে'র পর প্রায় বছর বারো পরে রবীন্দ্রনাথ আবার উপন্যাস রচনায় হাত দেন। বিশ্বভারতীর জন্য তখন তাঁর অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। তাই নূতন পত্রিকা 'বিচিত্রা'র ধনী প্রকাশকের কাছ থেকে লেখার প্রস্তাব আসতেই তিনি তা গ্রহণ করেছেন। প্রমথ চৌধুরীকে একটি চিঠিতে (১২ চৈত্র ১৩৩৩) লিখেছেন—"...'বিচিত্রা' নাম দিয়ে একটি কাগজ বের করবার উদ্যোগ চল্‌চে—যাঁরা উদ্যোগী তাঁরা উৎসাহী ও ধনী। তাঁদের দলে তোমার ও আমার পরিচিত কেউ কেউ

আছেন। আমি তাঁদের ফাঁদে কতকটা ধরা দিয়েছিল, অভাবের দায়ে, লোভের তাড়নায়। আমার দৈন্য যে কত কঠিন হয়ে উঠেচে সে তোমরা অনুমান করতে পারবে না—সেই কারণে নিষ্কামভাবে লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। নিজের কলমের জোরে ছাড়া সাধুতা রক্ষা করে অর্থোপার্জনের আর কোনো উপায় জানিনে।"[১৩] এর অল্প কিছুদিন পরে শিলং থেকে একটি চিঠিতে (২০মে, ১৯২৭) ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকেও লিখছেন—'বিচিত্রা'র জন্যে একটা গল্প লেখা চাই। গল্প 'বিচিত্রা'র গরজে ততটা নয় যতটা আমার নিজের গরজে। অর্থাগমের আর কোনো রাস্তা জানিনে, কলমের জোরে যা পারি।' এই গল্পটিই 'যোগাযোগ'।[১৪]

'যোগাযোগে'র পর রবীন্দ্রনাথ পত্রিকার কোন তাগিদ ছাড়াই 'শেষের কবিতা' রচনা করেন। এটি পরবর্তীকালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ১৯২৯)। 'শেষের কবিতা'র পর রবীন্দ্রনাথ বড় আকারের উপন্যাস লেখেন নি। শেষপর্বের তিনটি উপন্যাস 'দুইবোন', 'মালঞ্চ', 'চার অধ্যায়'। প্রমথনাথ বিশী এগুলিকে 'খন্ডপন্যাস' বলেছেন। 'বিচিত্রা' পত্রিকার জন্য 'দুইবোন' ও 'মালঞ্চ' রচিত হয়। বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৪ খ্রী., মে মাসে সিংহল গিয়েছিলেন সেখানেই 'চার অধ্যায়' রচনা করেন। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। একেবারে শেষ উপন্যাস বলে আমরা বিশ্লেষণের জন্য 'চার অধ্যায়'কে নিয়েছি। লক্ষ্যণীয় শেষ পর্যায়ে উপন্যাসের আকার কমেছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস ধারাবাহিক নয়। ঐতিহাসিক 'শেষের কবিতা' 'চার অধ্যায়' ছাড়া প্রায় সব উপন্যাসগুলি পত্রিকার প্রয়োজনে রচিত। যাইহোক বিভিন্ন উপন্যাসের ভাষা নিয়ে আমরা স্বতন্ত্র পর্যালোচনা করেছি। এই আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা নিম্নলিখিত লেখচিত্রটি প্রস্তুত করেছি। উপন্যাসের বিভিন্ন অংশের ভাষার নমুনা নিয়ে বিশ্লেষণ করে মোট শব্দ সংখ্যা ও তৎসম, তৎসম সমাসবদ্ধ পদ, ও সাধুক্রিয়াজাত পদের (সাধুশব্দ) সংখ্যার মোট শতকরা অনুপাত নির্ণয় করা হয়েছে। লেখচিত্রের নীচে ডানদিকে (→) বর্ষসংখ্যা ও উপরে (↑) শতকরা আনুপাতিক হার দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন উপন্যাসের বিভিন্ন অংশের Random ভাষা নমুনা বিশ্লেষণের ফল অনুসারে প্রাপ্ত লেখচিত্রে রবীন্দ্র উপন্যাসের ভাষাতাত্ত্বিক ক্রমটি স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। ভাষারীতির এই পরিবর্তন সম্পূর্ণভাবে ভাষা বিজ্ঞান সম্মত। লেখচিত্রে উপন্যাসের উপরে শতকরা অনুপাত দেখানো হয়েছে। লেখচিত্রে দেখা যায় রেখাটি অধোমুখী অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ভাষারীতি ক্রমশ সরলিকরণ ঘটেছে। বিভিন্ন উপন্যাসে প্রাপ্ত (সমাসবদ্ধ পদ, তৎসম শব্দ, সাধুক্রিয়া) মোট আনুপাতিক হার নিম্নরূপ।

বৌঠাকুরানীর হাট ২৭-৩০%	চতুরঙ্গ ১৫%
রাজর্ষি ২০-২৫%	ঘরে বাইরে ১০%
চোখের বালি ২০%	যোগাযোগ ৮%
নৌকাডুবি ১৮%	শেষের কবিতা ৫%
গোরা ১৫%	চার অধ্যায় ৭%

৫০
৪৫
৪০
৩৫
৩০
২৫
২০
১৫
১০
৫
শতকরা অনুপাত
বৎসর
১৮৮৩–৮৭
১৯০৩–০৫
১৯১০
১৯১৪–১৬
১৯২৭–১৯২৯
৩৩–৩৪

বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গভাবে রবীন্দ্রনাথের চারটি উপন্যাসকে ভাষাতাত্ত্বিক কোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বহিরঙ্গ বৈশিষ্ট্য যেমন—ভাষারীতির পরিবর্তন, নাট্যধর্ম, সংলাপধর্ম, কাব্যধর্ম, প্রবন্ধধর্ম, হাস্যরস, আলঙ্কারিক প্রয়োগের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, শব্দভাণ্ডার, শব্দার্থতত্ত্বে প্রাপ্ত রবীন্দ্র উপন্যাসের ভাষাবৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ ১. সাধু বাংলাগদ্য আর চলিত বাংলা গদ্য, এই শ্রেণিবিভাগের একটিমাত্র স্থূলভেদ রেখা আছে তা ক্রিয়াপদের রূপান্তর। বঙ্কিমের শেষের দিবের গদ্যরচনার কথ্যভঙ্গি বা প্যাটার্নের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথে এসে তা ইশারায় মাত্র রইল না স্পষ্ট আকার নিয়ে দেখা গেল।

২. একথা ঠিক যে ক্রিয়াপদের রূপান্তরে বাংলা উচ্চারণ ভঙ্গি অথবা বাকভঙ্গি বদলে যায়। বাংলা উচ্চারণে শব্দের অন্ত্যক্ষর ধ্বনি লোপ পায় ও আদ্যক্ষরের উপর জোর পড়ে। এর ফল সম্পর্কে আমরা সচেতন থাকি না। শব্দে হসন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সৃষ্টি হয় ব্যঞ্জন সংঘাত ও ঝোকের ফলে আসে গতিবেগ, ক্রিয়াপদে রূপান্তরের ফলে এই বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়ে দেখা দেয়। 'আকাশ থেকে একখানা অন্ধকার নামিয়া আসিল।' এই সাধুগদ্যের চলতি রূপ হবে 'আকাশ থেকে একখানা অন্ধকার নেমে এল।' এখানে অন্ত্যস্বরধ্বনি লোপ ও আদি অক্ষরে ঝোঁকের ফলে হসন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সৃষ্টি হয়েছে 'অন্ধকার' শব্দটির সিলেবেল দৈর্ঘ্য কমে গেছে। বাক্যে এসেছে গতিবেগ। রবীন্দ্রনাথের চলিত গদ্যের উপন্যাসগুলিতে এইভাবে বাক্যগুলি গতিশীলতা লাভ করেছে।

৩. স্বামী বিবেকানন্দ কোলকাতার ভাষা সাহিত্যরচনা করতে বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ভাষার রীতি মূলত কোলকাতা অঞ্চলের কথ্য ভাষার মার্জিত বা শিষ্ট রূপ। উত্তর কোলকাতার কথ্যভাষা ও রাঢ়ী উপভাষার শিষ্ট ও মার্জিতরূপই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের চলিত ভাষা।

৪. কোলকাতা অঞ্চলের উপভাষা বা কথ্যভাষা রবীন্দ্র উপন্যাসগুলির ভাষার মূল হলেও এই ভাষা কৃত্রিম। সরাসরি মুখের ভাষা নয়। এই ভাষা সাহিত্যিক ভাষা। বিবেকানন্দের চিন্তায় ও রবীন্দ্রনাথের ভাষা ভাবনায় কোলকাতার ভাষা সাহিত্য রচনার ভাষা হিসাবে প্রাধান্য পেয়েছে রবীন্দ্রনাথ সেই চিন্তাভাবনার সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

৫. রবীন্দ্র উপন্যাসের ক্রিয়ার কালের প্রয়োগ চলিত বাংলার মতো। অসমাপিকা ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়ার বহুল ব্যবহার রবীন্দ্র উপন্যাসের চলিত গদ্যরীতির প্রধান ভাষারীতি।

৬. সমাসবদ্ধপদ, উপসর্গ, অনুসর্গ প্রীতি, বিভিন্ন কারকের ব্যবহার, সংযোগ ক্রিয়ার, অস্তার্থক ক্রিয়া, নঞর্থক ক্রিয়া, প্রযোজক ক্রিয়ার ব্যবহার। শব্দদ্বিত্বের বহুল ব্যবহার রবীন্দ্র উপন্যাসে চলিত গদ্যরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৭. লিঙ্গ, বচন, অব্যয়ের ব্যবহার চলিত গদ্যরীতির অনুরূপ। কিন্তু অব্যয় প্রচলিত ক্ষেত্রে সংযোজক অব্যয় কিন্তু 'কিন্তু' দিয়ে বাক্যারম্ভ রবীন্দ্র গদ্যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়—এটি একটি বিশিষ্ট প্রয়োগও বটে। সমাসবদ্ধ পদের বহুল ব্যবহার রবীন্দ্রগদ্যরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তৎসম

শব্দজাত সমাসবদ্ধ পদের বহুল ব্যবহার প্রথমদিকের উপন্যাস 'বৌঠাকুরানীর হাট' 'রাজর্ষি'তে দেখা যায়। সেই সমাসবদ্ধ পদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটা আকর্ষণ ছিল। তাই চলিত গদ্যরীতির যুগেও আমরা সেই বৈশিষ্ট্য বহুল পরিমানে দেখতে পাই।

৯. অনুপ্রাস প্রবণতা, শব্দদ্বিত্ব, ধনাত্মক শব্দের বহুল প্রয়োগ রবীন্দ্রগদ্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

১০. 'করিনে', 'বলিনে' 'খাইনে' ইত্যাদি ক্রিয়াপদের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। এটি উত্তর কোলকাতার কথ্য ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হত। এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য আর কোন সাহিত্যিকের রচনায় তেমন দেখা যায় না। স্বস্তবতঃ ঠাকুরবাড়ির নিজস্ব কথ্যভাষার রীতিকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক গদ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

১১. শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ছুতমার্গ ছিলেন না। ইংরাজী শব্দের বহুল ব্যবহার রবীন্দ্র উপন্যাসে চলিত গদ্যরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইংরাজী শব্দ সাধারণত দুভাবে ব্যবহৃত হয়েছে সরাসরি ও অনুবাদের মধ্য দিয়ে কোথাও ইংরাজী শব্দের পারিভাষিক রূপ (পরিভাষা করে) ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও ইংরাজী শব্দ ইংরাজী বানানে ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও ইংরাজীর শিষ্ট উচ্চারণ বাংলায় লেখা হয়েছে।

১২. ইংরাজী ছাড়া অন্যান্য ভাষা থেকে আগত শব্দ রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন। সেই সমস্ত শব্দের ব্যবহার আরোপিত নয়, স্বতঃস্ফূর্ত, এছাড়া আরবী, পারসী, শব্দ ও ব্যবহৃত হয়েছে।

১৩. উচ্চারণ প্রবণতা অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু বানানের সরলীকরণ করেছেন যুক্তব্যঞ্জনকে ভেঙে। তবে সব বানানের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না।

১৪. ইংরাজী 'U' বাংলায় 'য়' রূপে উচ্চারিত হয়েছে।

১৫. মহাপ্রাণ ধ্বনির অল্প প্রাণীভবন দেখা যায় না।

১৬. অপিনিহিতিও নাসিক্যীভবনের প্রবণতা কম অভিশ্রুতির প্রাধান্য দেখা যায়, নাসিক্যভবণ কদাচিৎ দেখা যায়।

১৭. রাঢ়ী উচ্চারণ প্রবণতা অনুযায়ী 'অ' ধ্বনি 'ও' ধ্বনিতে উচ্চারিত কিন্তু বানানে তার সমতা রাখা হয়নি।

১৮. ইংরাজী ভাষা থেকে আগত কোন কোন শব্দে অপিনিহিতির প্রয়োগ দেখা যায়।

১৯. অঘোষ ধ্বনি সঘোষ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে উচ্চারিত হয় না তেমনি 'ল' ধ্বনি 'ন' ধ্বনিতে উচ্চারিত হওয়ার প্রবণতা চলিত গদ্যে দেখা যায় এখানে তা দেখা যায় না।

২০. দ্বিমাত্রিকতা এবং ব্যঞ্জনদ্বিত্বের প্রবণতা রবীন্দ্রগদ্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

২১. বিভিন্ন শব্দের বিচিত্র প্রয়োগ রবীন্দ্র উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। তৎসম শব্দের ব্যবহার রবীন্দ্রগদ্যে যেমন রয়েছে তেমনি তদ্ভব, দেশি বিদেশী শব্দের প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের গদ্যভাষাও যেন মহামানবের সাগরতীরে এসে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত ভাষার আত্মীকরণ করে নিজস্ব গদ্যরীতি পাঠককে উপহার দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

২২. সামান্য আয়োজনে জমে উঠে রবীন্দ্রগদ্য সরসতার ঔজ্জ্বল্যে পৌঁছে গেছে।

২৩. নতুন সৃষ্ট শব্দ ও তার ব্যবহারে রবীন্দ্র গদ্য অনন্য।

২৪. বাক্যে অনুপ্রাসের প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের গদ্যে বহুল ব্যবহার। এই অনুপ্রাসের ব্যবহার বঙ্কিম গদ্যের অনুরূপ নয়। নিজস্বতায় পরিপূর্ণ।

২৫. সংযোজক চিহ্নের পরিবর্তে '—' চিহ্নের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির নিজস্বতা।

২৬. প্রবাদ, প্রবচন, অলঙ্কারের ব্যবহারে রবীন্দ্র বিশিষ্ট শিল্প সুষমায় পৌঁছে গেছে।

২৭. ভাষায় চলিত ভাষার মেজাজ অক্ষুন্ন আছে, কথ্যরীতি প্রধান শব্দের ব্যবহারে।

২৮. ব্যঞ্জনাময় বিশেষণ পদের ব্যবহার, পৌনপুনিকতায় ধ্বনিস্পন্দময় তৎসম শব্দের ব্যবহার, হালকা দেশজ চালের শব্দ ব্যবহার রবীন্দ্র চলিত গদ্য হয়ে উঠেছে সরস ও ধ্বনিস্পন্দময়।

২৯. চলিত ভাষা নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে ভাষাকে নিয়ে কি পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া যায় তার সার্থক উদাহরণ 'শেষের কবিতা'র ভাষা। কিন্তু 'ঘরে বাইরে' থেকে যে পরীক্ষার সূত্রপাত সেই পরীক্ষার চরম উৎকর্ষে পৌঁছল 'শেষের কবিতা'য়। গদ্যভাষা হয়ে উঠল কবিতা। আমরা রবীন্দ্রগদ্যের শেষ পর্বে দেখি গদ্যপদ্য, মিলে মিশে একাকার।

৩০. চলিত ভাষায় স্বচ্ছন্দগতি ও লাবণ্যে, দ্রুতচলন ও নমনীয়তায় শক্তি ও সৌন্দর্যে, লাবণ্য ও দীপ্তিতে তীর্যকপূর্ণ ভাষারীতিতে শানিত দীপ্তিতে, বৈদগ্ধপূর্ণ ভাষারীতি ও হাস্যরস, মনজিত ভাষা ব্যবহারে কখনও দার্শনিকতার প্রকাশে রবীন্দ্র চলিত গদ্যরূপ অপূর্ব ও অনন্য। যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে ততদিন রবীন্দ্রনাথের চলিত গদ্যের শিল্পসুষমা মণ্ডিত গদ্য ততদিন আলোচিত হবে। পরবর্তী প্রজন্মের পাঠক ও মুগ্ধ হবেন রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' পড়ে।

রবীন্দ্র চলিত ভাষার বেশি কিছু ত্রুটি এই প্রসঙ্গে আলোচনা করি চরিত্র অনুযায়ী সংলাপের ভাষা সর্বত্র রক্ষিত হয়নি। 'চার অধ্যায়ে'র কানাই গুপ্তের ভাষা' কিছুটা আড়ষ্ট ও কৃত্রিম বলে মনে হয়। রবীন্দ্রগদ্য বিশ্লেষণ ধর্মী। অতিরিক্ত বিশ্লেষণ প্রবতা, তৎসম সমাসবদ্ধ পদের প্রতি বাড়তি আকর্ষণ, বাগ্‌বৈদগ্ধপূর্ণ ভাষারীতি কোথাও ভাষার গতিকে রুদ্ধ করেছে। তবে যে গদ্য পাঠককে তিনি উপহার দিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য দলিল হয়ে থাকবে।

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রচর্চা' (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়) গ্রন্থ থেকে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে চলিত গদ্যরীতির ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা সংক্রান্ত কোন গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে হয়নি। শুধু তাই নয় সমালোচকদের জিজ্ঞাসা থেকে একথা স্পষ্ট যে এ বিষয়ে প্রকাশিত গ্রন্থগুলিও উৎসাহী পাঠকদের সেই তৃষ্ণা মেটাতে পারে নি। আশাকরি এই গবেষণা একটি মৌলিক গবেষণা কর্মরূপে, বাংলা ভাষাতত্ত্ব চর্চার ধারায় বিশিষ্ট স্থান অর্জন করবে এবং উপস্থাপিত বিষয় এবং ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিষয় কর্মটির যথার্থ মূল্যায়ন আমার গবেষণা কর্মটির মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে বলে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি।

গ্রন্থসূত্র

১. খান মনিলাল, ২০০০, বাংলা চলিতগদ্য, কলকাতা, সোনার তরী, পৃ. ১৩

২. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৯, বাংলা শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্র রচনাবলী (দশম খণ্ড), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,পৃ. ৬১৫

৩. দাশ নির্মল, ২০০১, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ (২য় সংস্করণ), কলকাতা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৫৫-৫৬

৪. মুখোপাধ্যায় অরুন, ১৩৭৪, বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা, ক্লাসিক প্রেস।

৫. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৯, বাংলা শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্র রচনাবলী (দশম খণ্ড), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,পৃ. ৬০০

৬. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৯, বাংলা শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্র রচনাবলী (দশম খণ্ড), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

৭. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৯, বাংলা শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্র রচনাবলী (দশম খণ্ড), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

৮. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৯, বাংলা শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্র রচনাবলী (দশম খণ্ড), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কোলকাতা

৯. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৯, বাংলা শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্র রচনাবলী (দশম খণ্ড), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

১০. লায়েক আলি খান, ২০০৫, রবীন্দ্র প্রবন্ধ সমীক্ষা, কলকাতা, সৃজন প্রকাশন, পূঃ মেদিনীপুর, পৃ. ৫২৭

১১. দেবনাথ ধীরেন্দ্র, ১৩৪৮, উপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, এ. কে. সরকার এন্ড কোং, পৃ. ১৫৪

১২. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'চোখের বালির' উপন্যাসের 'সূচনা' অংশ, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী সংস্করণ

১৩. রবীন্দ্র রচনাবলী (বিশ্বভারতী), ষষ্ঠখণ্ড, 'গ্রন্থ পরিচয়' অংশ

১৪. বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, প্রমথনাথ বিশী, তথ্য সহায়তা—অরুন মুখোপাধ্যায়, ১৩৭৪, বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা, ক্লাসিক প্রেস, পৃ. ২৫৮

১৫. দেবনাথ ধীরেন্দ্র, ১৩৪৮, ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ, এ. কে. সরকার এন্ড কোং, কোলকাতা, পৃ ২৬৪-৬৫